

বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা এবং বিহারের সমন্বয় বিদ্যালয়

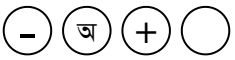


জুলিয়ান ফ্রান্সিস

জুলিয়ান ফ্রান্সিস

প্রকাশ: ১২ জুলাই ২০২৬ | ০৭:৪০

| প্রিন্ট সংস্করণ



সমাজসেবী ও উন্নয়নকর্মী ব্রিটিশ নাগরিক জুলিয়ান ফ্রান্সিস বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধু। অক্সফামের সাবেক এই কর্মকর্তা মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের শরণার্থীদের নিয়ে কাজ করেছেন। স্বাধীনতার পর তিনি দেশের বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাক, প্রশিকা, গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র গঠন ও বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন। এ দেশে প্রতিবন্ধীদের অধিকার আদায়ে সংগঠন ও আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তিনি অন্যতম পথিকৃৎ। বাংলাদেশ সরকার তাঁকে এ দেশের নাগরিকত্ব প্রদান করেছে। প্রবীণ এই উন্নয়নকর্মীর বাংলাদেশের জন্য শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে লেখাটি সমকালের পাঠকদের জন্য অনুবাদ করেছেন গওহার নঈম ওয়ারা।

কভিড মহামারির সময় বাংলাদেশের শিশুদের কাছ থেকে কার্যত তাদের শিক্ষার অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে। এত দিনেও দেশের শিক্ষাব্যবস্থার দায়িত্বে থাকা কর্তৃপক্ষ শিশু শিক্ষার্থীদের শিক্ষা বাস্তবমুখী করতে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করেনি।

কভিডের দুঃসময়ে অনেক দিন যখন আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যত বন্ধ ছিল, তখন শিশুদের হাতে-কলমে শেখার বিকল্প পদ্ধতি চালুর বিরল সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু তেমন উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। আমার এই অনুভূতি ও পর্যবেক্ষণের পেছনে রয়েছে ৫০ বছরের বেশি সময় আগে বিহারে কাজের অভিজ্ঞতা। তখন বুদ্ধগয়ার সমন্বয় আশ্রমে কৃষিবিষয়ক স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করছিলাম। সেখানে অক্সফাম-যুক্তরাজ্যের সহায়তায় গান্ধী আশ্রমের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে দেখেছি কীভাবে সমাজের সবচেয়ে দরিদ্র পরিবারের শিশুরাও শিক্ষালাভের মাধ্যমে দারিদ্র্য ও শোষণের শিকল ভাঙতে পারে।

দুর্ভিক্ষ থেকে বিদ্যালয়ের জন্ম

১৯৬৬-৬৭ সালে বিহারে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের পর এক দিন আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা দ্বারকো সুন্দরানি এক গ্রামের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন। সঙ্গে ছিলেন ফরাসি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ‘ব্রাদার টু অল মেন’-এর এক ফরাসি কর্মী।

হঠাৎ শতছিন্ন বস্ত্র পরিহিত এক নারী গাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালেন। মুসাহার নামে বিহারের একটি জাতিগোষ্ঠীর সেই নারী জানালেন, ছয় দিন ধরে তিনি অভুক্ত। তিনটি কন্যা সন্তান রেখে ছয় মাস আগে তাঁর স্বামী মারা গেছেন সাপের কামড়ে। মেয়েদের বাঁচিয়ে রাখার কোনো সম্ভব নেই তাঁর হাতে। দ্বারকো তাঁকে পাঁচ রুপি দিয়ে জানতে চাইলেন- কতদিন চলতে পারবেন। নারীটি বললেন, সর্বোচ্চ পাঁচ দিন।

এই ঘটনা দ্বারকোকে গভীরভাবে নাড়া দেয়। তিনি সিদ্ধান্ত নেন, তপশিলি জাতি ও তপশিলি ‘উপজাতি’র দরিদ্র ছেলেমেয়ের জন্য একটি আবাসিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করবেন। তিনি ওই মাকে অনুরোধ করেন তাঁর একটি মেয়েকে এই শিক্ষা ও দারিদ্র্যবিরোধী পরীক্ষামূলক উদ্যোগে ভর্তি করতে। এভাবেই ১৯৬৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় সমন্বয় বিদ্যালয়। বুদ্ধগয়ার কাছের এক মহন্ত এই শিক্ষা-পরীক্ষার জন্য ৩১ একর জমি দান করেন। শুরুতে ৫০টি গ্রামের সবচেয়ে দরিদ্র পরিবার থেকে ছেলেমেয়ে ভর্তি করা হয়। ১৯৬৮ সালের বর্ষাকালে দ্বারকো তাঁর অক্সফাম সহকর্মী এবং আমার তত্ত্বাবধায়ক অ্যালান লেদারের সঙ্গে একটি গ্রামে যান। আশ্রমের এক কর্মী সেখানে এক অনাথ শিশুকে বিদ্যালয়ের জন্য নির্বাচন করেছিলেন। তাঁর নাম ছিল ধর্মনাথ।

দ্বারকো ও অ্যালান যখন ধর্মনাথকে নিয়ে ফিরছিলেন, তখন মাঝনদীতে পৌঁছতেই জমিদার ভাবান সিংয়ের লাঠিয়ালরা আক্রমণ করতে আসে। অপরাধ একটাই- ধর্মনাথ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষ, আর তাঁর ঋণ আছে। ধর্মনাথের মায়ের শেষকৃত্যের ছয় রুপি খরচ করেছিলেন জমিদার। তাই আজীবনের জন্য ধর্মনাথকে বন্ধকি শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে বাধ্য করছিলেন তিনি। জমিদারের রাগের কারণ, ধর্মনাথ স্কুলে গেলে তিনি একজন শ্রমিক হারাবেন।

দ্বারকো দাসত্ব ও জোরপূর্বক শ্রমের বিরুদ্ধে কথা বলেন। কিন্তু যতই তিনি যুক্তি দেন, জমিদার ও তাঁর লোকজন ততই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। এদিকে অ্যালান পুরো ঘটনার ছবি তুলেছিলেন। ছবি তোলার কারণে হামলাকারীরা আশঙ্কা করে, তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ তৈরি হয়েছে। শেষ পর্যন্ত তারা ফিরে যায়।

কয়েক মাস পর এক দিন দ্বারকো বিদ্যালয়ে বসে ছিলেন। হঠাৎ দেখলেন ধর্মনাথ বিদ্যালয়ে ঢুকছে। তিন মাসের মধ্যে ছেলেটি যেন সম্পূর্ণ বদলে গেছে। দ্বারকো জিজ্ঞেস করলেন, ‘জমিদার যদি আবার ধরে নিতে চায়?’ ধর্মনাথ দৃঢ় কণ্ঠে উত্তর দিয়েছিল- ‘আমাকে স্কুল থেকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে নকশালরা তাকে খুন করবে।’ দ্বারকো বুঝতে পারলেন, গ্রামের ওপর প্রভাব বিস্তারকারী বামপন্থি নকশাল আন্দোলনের কর্মীরাই ধর্মনাথকে বিদ্যালয়ে পাঠিয়েছে।

দ্বারকো প্রায়ই বলতেন, ‘দারিদ্র্য সহিংসতা ও ঘৃণার জন্ম দেয়। শিক্ষা জন্ম দেয় সদিচ্ছা, শান্তি ও সম্প্রীতির।’

দ্বারকো সুন্দরানি শিক্ষাকে তিনটি শব্দে ব্যাখ্যা করতেন। ক. যোগ- মানুষের শারীরিক, মানসিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও আত্মিক বিকাশের সমন্বিত শিক্ষা। খ. উদ্যোগ- শিক্ষা ও উৎপাদনশীল শ্রমের সমন্বয়, যা মানুষকে আত্মনির্ভর হতে শেখায়। গ. সহযোগ- প্রকৃতি ও সমাজের সঙ্গে সম্প্রীতিপূর্ণ সহাবস্থান। তাঁর মতে, শিক্ষার উদ্দেশ্য শুধু পড়তে-লিখতে শেখানো বা অঙ্ক শেখানো নয়। এগুলো কেবল মাধ্যম। শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য শিশুর ব্যক্তিত্বের বিকাশ। এই বিকাশ ঘটে পরিবার ও বিদ্যালয় দুই জায়গাতেই। তাই শুধু শিশু নয়; পরিবারকেও শিক্ষিত ও সক্ষম করে তুলতে হবে।

প্রাপ্তবয়স্কদের ও শিশুদের শিক্ষা পাশাপাশি চলতে হবে। শিক্ষা অবশ্যই উন্নয়নকর্মের সঙ্গে যুক্ত থাকতে হবে। শিক্ষা ও জীবিকারও সংযোগ ঘটাতে হবে। সমন্বয় বিদ্যালয়ে শিক্ষা যুক্ত করা হয়েছিল কৃষিকাজ; যন্ত্র ও বৈদ্যুতিক মোটর মেরামত, জিপ চালানো এমনকি রাজমিস্ত্রির কাজেও। পাশাপাশি সৃজনশীল সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডও শিক্ষার অংশ।

সনদ নয়, জীবনের শিক্ষা

সাধারণত বিদ্যালয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্য সনদ অর্জন ও চাকরি। কিন্তু সমন্বয় বিদ্যালয়ে সরকারি অনুদান, পাঠ্যপুস্তক, পরীক্ষা ও সনদ দেওয়া হতো না। উপরন্তু শিশুদের শেখার পাশাপাশি আয় করার সক্ষমতা গড়ে তোলা হতো। প্রায় একশ ছেলেমেয়ে এই শিক্ষা-পরীক্ষায় অংশ নিত।

বিহারের বিদ্যালয়ে গ্রামের সমস্যাই হয়ে উঠেছিল শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবই। যেমন- ভিটামিনের অভাবে আশপাশের গ্রামে রাতকানা রোগ দেখা দিত। তাই বিদ্যালয় থেকে প্রত্যেক শিশুকে সবজির বীজ, পেঁপে গাছের মোট ১৩টি চারা দেওয়া হতো। এর ফলে পরিবারগুলো পুষ্টিকর খাবার খেয়ে অতিরিক্ত ফল, সবজি বিক্রি করত।

বিহারের এ অঞ্চলে কলেরা ছিল বিস্তৃত রোগ। তাই শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা গ্রামে গিয়ে পানীয় জল ও কূপ জীবাণুমুক্ত করতেন। গ্রামের জৈব বর্জ্য থেকে কম্পোস্ট সার তৈরি করতেন। তাদের ভাষা, গণিত ও বিজ্ঞান শেখানো হতো সবজি উৎপাদন, কম্পোস্ট তৈরি, স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতার বাস্তব কাজের মধ্য দিয়ে। আমি শেষবার, ২০ বছর আগে সেখানে গিয়ে দেখেছিলাম, সরকার কিছু আর্থিক সহায়তা দিচ্ছিল এবং বিদ্যালয়ের সম্প্রসারণ কার্যক্রম থেকে বছরে প্রায় সাত লাখ রুপি মূল্যের সবজি,

ফল ও জৈব সার উৎপাদিত হচ্ছিল। সেখানে অনন্য উদাহরণ তৈরি হয়েছিল সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির। দেখেছি মুসলিম শিক্ষকরা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে মুসলিম ছাত্রীদের রামায়ণ পড়াচ্ছেন। হিন্দু শিক্ষকরা হিন্দু শিশুদের পবিত্র কোরআন সম্পর্কে শিক্ষা দিচ্ছেন। যে অঞ্চলটি ছিল একসময় সশস্ত্র উগ্রপন্থিদের প্রভাবাধীন, সেই অঞ্চলে এই শিক্ষা ব্যবস্থার ইতিবাচক প্রভাব এতটাই ছিল, আমার সফরের সময় ২৫ জন তরুণ উগ্রপন্থি সহিংসতার পথ ছেড়ে এই কর্মসূচিতে যোগ দিয়েছিল।

অন্য দেশের একটি শিক্ষা প্রয়োগ নিয়ে এত দীর্ঘ আলোচনা করার জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী। তবে বাংলাদেশের শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের উচিত গুরুত্বের সঙ্গে ভাবা- বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকা ও শহরের বস্তিগুলোতে কীভাবে শিক্ষাব্যবস্থাকে আরও সহনীয়, বাস্তবমুখী ও জীবনঘনিষ্ঠ করা যায়। বাংলাদেশে অসংখ্য শিশু পরিবারের আয় বাড়ানোর জন্য বিদ্যালয় ছেড়ে দেয় বা ওমুখো যেতেই পারে না। চরম দরিদ্র পরিবারের বাস্তব চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা আজ অত্যন্ত জরুরি। নিশ্চয়ই আমরা চাইলে এ বিষয়ে কিছু না কিছু করতে পারি।

জুলিয়ান ফ্রান্সিস: বাংলাদেশের বন্ধু